Yunus

পত্রিকা আর্কাইভ কক্ষ
৬৫৭

বাংলার কথা

অধিকৃত বাঙলাদেশে

বাঙালী বিতাড়ন ও নিধন নীতির আড়ালে

আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী
[সহযোগী সম্পাদক, দৈনিক পূর্বদেশ ঢাকা]

বাংলাদেশ থেকে এ পর্যন্ত সত্তর লাখ নরনারী বাস্তুত্যাগ করেছেন। আরো হাজারে হাজারে, লাখে লাখে শরণার্থী দেশত্যাগ করছেন। ভারতের ত্রিপুরা, মেঘালয়, আসাম বা পশ্চিমবঙ্গ সান্নিহিত সীমান্ত এলাকা যাঁরা অতি সম্প্রতি ঘুরে এসেছেন, তাঁরাও বলছেন, পাক-বাহিনীর অত্যাচারে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ ও খৃষ্টান নির্বিশেষে বাঙ্গালীদের দেশত্যাগ হ্রাস পায়নি। বন্ধ হওয়া তো দূরে থাক।

গত ৩রা জুন তারিখে আমিও সপরিবারে দেশত্যাগ করে ত্রিপুরা রাজ্যের সোনামুড়া সীমান্ত ফাঁড়িতে উপস্থিত হই। আমার সঙ্গে ছিলেন কমপক্ষে পাঁচশো পরিবার। সেদিনই তাঁরা সীমান্ত অতিক্রম করেছেন। সোনামুড়া থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলার মানুষ। বহু বছর আগে ভারতীয় নাগরিক হয়েছেন। আমাকে শরণার্থীদের প্রবেশ-তালিকা দেখিয়ে বললেন, 'আপনাদের এন্ট্রি ফরম পূরণ করতে হিমসিম খাচ্ছি। আমার ষ্টাফ কম। দেখতেই পাচ্ছেন অবস্থা।'

অবস্থা নিজের চোখেই দেখছিলাম। থানার আঙ্গিনা, ট্যাক্সি ষ্ট্যান্ড, রাস্তা, গাছতলা,—দোকান ও বাড়ীঘরের বারান্দা সব যেন শরণার্থী শিবিরে পরিণত হয়েছে। প্রচন্ড রোদে গাছতলায় মায়ের কোলে ধুঁকছে শিশু। ক্ষুধায় চীৎকার জুড়েছে। সে এক অবর্ণনীয় দৃশ্য। ভারতে যে হারে লোক আসছে, তার সঠিক হিসাব রাখা এ পর্যন্ত সম্ভব হয়েছে, আমার তা মনে হয় না। এই বিপুল বিশাল জনস্রোতের পরিমাণ নির্ধারণ সম্ভব নয়। সোনামুড়া ফাঁড়িতে বসে এই আশ্রয়হীন, অন্নহীন, বস্ত্রহীন মানুষের বিরাট মিছিলের দিকে তাকিয়ে আমি সেদিন ভাবছিলাম, কত বড় মিথ্যাবাদী হলে ইয়াহিয়া সরকার প্রচার করতে পারেন, শরণার্থীদের সমস্যা নিয়ে ভারত সরকার অতিরঞ্জিত প্রচারণা চালাচ্ছেন। পাক বেতার প্রত্যহই এই ছিন্নমূল, দুর্দশাগ্রস্ত লক্ষ লক্ষ পরিবারের হাহাকারভরা অভিযোগকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিচ্ছেন আর এদের নিয়ে করছেন মর্মান্তিক রসিকতা।

ভারতে আগত শরণার্থীদের মধ্যে বেশীর ভাগ হিন্দু, তাতে কোন সন্দেহ নেই। সম্প্রতি ইউ পি আই সংবাদ সংস্থার এক খবরে বলা হয়েছে, সত্তর লাখ শরণার্থীর মধ্যে কয়েক লাখ মুসলমান বাদে আর সবই হিন্দু। আমার মতে এই লাখ লাখ হিন্দুর মধ্যে কয়েক হাজার বৌদ্ধ, খৃষ্টান এবং উপজাতীয় অধিবাসীও রয়েছেন। বাংলাদেশে মুসলমানেরা বিপুলভাবে সংখ্যাগুরু; তার পরেই হিন্দুদের স্থান। ২৫শে মার্চের আগে বাংলাদেশে এক কোটি থেকে সওয়া কোটি হিন্দু ছিলেন। বর্তমানে দেশত্যাগী সত্তর লাখ শরণার্থীর মধ্যে অন্তত ৬০ লাখ হচ্ছে হিন্দু, এই হিসাব অবিশ্বাস্য নয়। কেন নয়, সে কথাই বলছি।

ক্রসধারী হিন্দু

মে মাসের একুশ তারিখে বরিশাল থেকে 'এলিয়টগঞ্জ' নামে একটা দোতলা লঞ্চে ঢাকা আসছিলাম। বরিশাল ও ঢাকার মধ্যে নদীপথে স্বাভাবিক যোগাযোগ তখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ষ্টীমারের কোন পূর্ব নির্ধারিত সময়সূচী নেই। তার আগের দিন বরিশাল থেকে কিছুদূরে নন্দীরবাজার ঘাটে গেরিলা বাহিনী ষ্টীমারে হ্যান্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। ফলে ঢাকাগামী ষ্টীমারটি বরিশালে ফিরে আসে এবং দুদিন ষ্টীমার সার্ভিস বন্ধ থাকে। আমি তাই লঞ্চে ঢাকা ফিরছিলাম। ষ্টীমারের ডেকে লুঙ্গী-পরা কজন যাত্রীকে ভীত সন্ত্রস্তভাবে বসে থাকতে দেখলাম। তাদের সকলের গলাতেই ক্রস ঝুলছে। একজনকে ডেকে কারণ জিজ্ঞাসা করতেই সে ফিসফিসিয়ে বলল, তারা সকলেই বাঙ্গালী খৃষ্টান। বরিশালের কাছেই পাদ্রী শিবপুর গ্রামের খৃষ্টান মিশনারীর সঙ্গে তারা যুক্ত। পাক-বাহিনী সেই গ্রামে ঢুকে তাদের হিন্দু ভেবে নির্বিচারে হত্যা করেছে। যারা বেঁচেছে, তারা গলায় ক্রস ঝুলিয়ে চলাফেরা করছে। পাক বাহিনীর স্থানীয় কম্যান্ডার হুকুম দিয়েছেন, সকল খৃষ্টানকে গলায় ক্রস ঝুলিয়ে চলাফেরা করতে হবে। নইলে তাঁর সেনারা যদি কাউকে হিন্দু ভেবে হত্যা করে, তাহলে তাঁর সেনাদের কসুর হবে না।

এমন ঘটনা অবিশ্বাস্য। গলায় ক্রস না ঝুলোলে দেশী খৃষ্টানদের হিন্দু ভাবা হবে এবং দেশের একজন নাগরিক শুধুমাত্র ধর্মে হিন্দু এই অপরাধে নির্বিচারে তাকে হত্যা করা হবে, এমন ঘটনা চোখে না দেখলে কেবল কানে শুনে এ যুগে বিশ্বাস করা কঠিন। ঢাকা পৌঁছে কানের নয়, চোখেরও বিবাদ-ভঞ্জন হল। প্রায় জনশূন্য ঢাকা নগরীর রাজপথে এমন ক'জন পথচারী চোখে পড়ল, যাদের গলায় ক্রস ঝুলোনো। ঢাকার শহরতলী কমলাপুরে বৌদ্ধ মঠ রয়েছে। সেখানকার এক ভিক্ষু, গলায় কাগজ ঝুলিয়ে তাতে উর্দু ভাষায় লিখেছেন, 'আমি বৌদ্ধ, হিন্দু নই। দয়া করে আমাকে হত্যা করবেন না।' ঢাকার একটি বাংলা দৈনিকের ষ্টাফ ফোটোগ্রাফার এই বৌদ্ধ ভিক্ষুর সবিজ্ঞাপন ছবি তুলেছিলেন। ফলে তিনি তাঁর ক্যামেরাটি হারিয়েছেন এবং শারীরিকভাবে নির্যাতিত হয়েছেন।

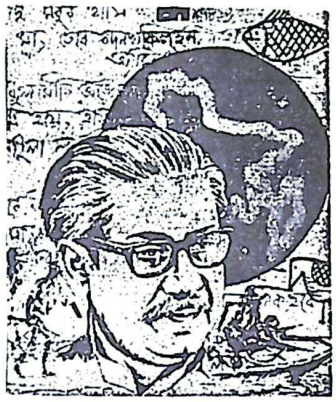

'আমি অঞ্জলি দাস নই, এঞ্জেলিক ডায়াস'

ঢাকার 'পাকিস্তান অবজার্ভার' পত্রিকার এপ্রিল ও মে মাসের ফাইল যদি কারো কাছে থাকে, তিনি যেন দয়া করে তার পাতা উল্টিয়ে দেখেন। এই সময় নাম-পরিবর্তনের বিজ্ঞাপনের হিড়িকে ঢাকার দু'একটি কাগজের পাতা ভরে উঠেছিল। 'পাকিস্তান অবজারভারে' প্রকাশিত এমনি একটি বিজ্ঞাপন 'আমার নাম অঞ্জলি দাস নয়, এঞ্জেলিক ডায়াস এবং আমি হিন্দু নই, দেশী খৃষ্টান।'

কিন্তু এত করেও বহু শিক্ষিত বাঙ্গালী খৃষ্টান পরিবার বাঁচেননি। এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে ঢাকার লক্ষ্মী বাজারে অবস্থিত সেন্ট জোসেফ গীর্জা এবং স্কুলের একজন শ্বেতাঙ্গ যাজক আমাকে জানান, তাঁদের স্কুলে বহু দেশী খৃষ্টান পরিবার আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। পাক বাহিনীর লোকেরা এক রাতে হানা দিয়ে তাদের মধ্য থেকে বেছে বেছে ত্রিশজন সক্ষম যুবককে ধরে নিয়ে যায়। তাদের আর কোন খোঁজ নেই। ধৃতদের মধ্যে সেন্ট জোসেফ স্কুলের কয়েকজন শিক্ষকও ছিলেন। ২৫শে মার্চের পর প্রায় দেড় মাস পাক বাহিনীর মধ্যে একটা অন্ধ উন্মাদনা ছিল, বাঙ্গালী পেলেই হত্যা কর। তারা হিন্দু-মুসলমান যাই হোক। এরপর তাদের মধ্যে নতুন উন্মাদনা সঞ্চার করা হল, 'কাফের হত্যা কর।' আর এই কাফের বলতে অবশ্যই বাঙ্গালী হিন্দুদের বোঝায়।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর
সাহিত্যবিশারদ কোষ প্রকল্প
সং নং......

হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে বাঙালী হত্যার পর দ্বিতীয় পর্যায়ে কেবল হিন্দু নিধন যজ্ঞ পূর্ব পরিকল্পিত রাজনৈতিক চক্রান্ত। ইসলামাবাদের জঙ্গী-চক্র এটা জানেন, সামরিক অভিযান চালিয়ে সাড়ে পাঁচ কোটী বাঙালী মুসলমানকে হত্যা করে বাংলাদেশ বাঙালী শূন্য করা সম্ভব নয়। কিন্তু এক কোটী বা সওয়া কোটী বাঙালী হিন্দুর বিরুদ্ধে হত্যাভিযান চালিয়ে তাদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশকে নিধন করা সম্ভব এবং বাকী অংশকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করে ভারতে ঠেলে দিয়ে বাংলাদেশকে হিন্দুশূন্য করা সহজ। ২৫শে মার্চের সামরিক তৎপরতার দ্বিতীয় পর্যায়ের উদ্দেশ্য তাই, বাংলাদেশ হিন্দুশূন্য করা। জঙ্গী সরকারের পরামর্শদাতাদের ধারনা, উদীয়মান বাঙালী মুসলমানের মেরুদন্ড সরকারী কর্মচারী, ছাত্র সংস্থা, বেঙ্গল রেজিমেন্ট পুলিশ ও ব্যবসায়ী সমাজকে আকস্মিক আক্রমণ দ্বারা গুঁড়িয়ে দিলে এবং সেই সঙ্গে বাংলাদেশকে হিন্দুশূন্য করা হলে বাঙালী জাতীয়তাবাদ, বাংলার রাজনৈতিক ও সংস্কৃতিক প্রতিরোধ ক্ষমতা ধ্বংস হবে এবং বাংলার মুসলমান চাষী ও কৃষক সমাজ পরবর্তী দশ বছরের জন্য (অর্থাৎ গুঁড়িয়ে যাওয়া বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজ আবার শিরদাঁড়া সোজা না করা পর্যন্ত) ইসলামাবাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক তাঁবেদারী মেনে নেবে। বাংলাদেশকে হিন্দুশূন্য করার চক্রান্তের আরেকটি উদ্দেশ্য, লক্ষ লক্ষ শরণার্থীকে ভারতের কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে ভারতের অর্থনীতি বিপর্যস্ত করা, যাতে ইন্দিরা সরকার ইসলামাবাদের বিরুদ্ধে কোন কঠোর ও বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ ও অবকাশ না পান। দ্বিতীয়, হিন্দু উদ্বাস্তু ঠেলে দিয়ে ভারতে এমন এক পরিস্থিতি সৃষ্টি করা, যাতে এখানে সাম্প্রদায়িক অশান্তি সৃষ্টি করা, যাতে এখানে সাম্প্রদায়িক অশান্তি দেখা দেয় এবং ইসলামাবাদ পরিস্থিতির পুরো-পুরি সুযোগ নিয়ে নিজেদের বর্বরতাকে ঢাকা দিতে পারে এবং বাংলাদেশের সঙ্গে তার বিরোধকে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার সংখ্যা-লঘু সম্প্রদায় সম্পর্কিত একটা সমস্যা হিসাবে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরে বাংলাদেশের আসল রাজনৈতিক সমস্যা চাপা দিতে পারে। ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টির জন্য ইসলামাবাদের জঙ্গী-চক্র করেননি এমন কোন কাজ নেই। অধিকৃত বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে তারা বাঙালী মুসলমানকে হিন্দু প্রতিবেশীর ঘর-বাড়ি লুঠ করা এবং অগ্নিসংযোগের জন্য তিন ঘন্টার সময় দিয়ে নোটিশ দিয়েছেন। গ্রামের চোর-ডাকাতদের অপরাধ অনুষ্ঠানের ঢালাও সুযোগ ও অনুমতি দেওয়া হয়েছে। হিন্দু প্রতিবেশীকে আশ্রয়দানের অপরাধে মুসলমান গৃহস্বামীকে হত্যা করা হয়েছে। ঢাকা শহরের সম্পন্ন ব্যবসায়ী এবং ভাসানী-পন্থী ন্যাপের এককালের নেতা জনাব সাইদুল হাসান তাঁর ব্যবসায়ের হিন্দু পার্টনারকে স্বগৃহে আশ্রয় দিয়েছিলেন। এই অপরাধে তাঁকেও গ্রেপ্তার করা হয়। আমার ঢাকা ত্যাগের প্রাক্কালেও জানা যায়নি, সাইদুল হাসান বেঁচে আছেন কিনা। ঢাকার জনপ্রিয় বাংলা দৈনিক 'ইত্তেফাকের' অফিস পাক বাহিনী অগ্নিসংযোগে ধ্বংস করে। দীর্ঘ ৫৬ দিন পর সামরিক কর্তৃপক্ষ নিজেদের গরজে যখন পত্রিকাটি পুনঃপ্রকাশের ব্যবস্থা করে দেন, তখন পত্রিকায় হিন্দু কর্মচারীদের আশ্বাস দেয়া হয় যে, তাদের নিরাপত্তা কোনভাবে বিঘ্নিত হবে না। এই আশ্বাসের উপর নির্ভর করে পত্রিকার প্রধান হিসাব-রক্ষক শ্রীঅনিল দাস আরো কয়েকজন হিন্দু কর্মচারী-সহ আত্মপ্রকাশ করেন। সঙ্গে সঙ্গে সেনাবাহিনী তাঁর বাড়ী ঘিরে ফেলে। শ্রীদাস সেনাবাহিনীর হাতে ধরা পড়ে নির্যাতিত হওয়ার ভয়ে দোতলার ছাদ থেকে ঝাপ দেন এবং মৃত্যুবরণ করেন। কোথাও কোথাও দরিদ্র শ্রেণীর মুসলমান প্রতিবেশী কখনো সৈন্যদের ভয়ে, কখনো বা প্রলোভনে পড়ে হিন্দু-দের ঘরবাড়ী লুঠপাট করেছে। স্থানে স্থানে সমাজ-বিরোধী ব্যক্তিরা মুসলিম লীগ ও জামাতে ইসলামীর গুন্ডাদের সঙ্গে মিশে রাজনৈতিক 'কভার' নিয়ে হিন্দু পরিবারের উপর নির্যাতন চালিয়েছে, তাদের যথাসর্বস্ব লুঠ করেছে। এই ধরনের সমাজবিরোধী তৎপরতার পেছনে জঙ্গী-চক্রের প্রশ্রয় ও সমর্থনদনের আসল উদ্দেশ্য, দেশ-ত্যাগী হিন্দুর একটা মুসলিম-বিরোধী মনোভাব নিয়ে ভারতে যাক এবং এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে সেখানে সাম্প্রদায়িক অশান্তি দেখা দিলে জঙ্গী-চক্রের মনোবাঞ্ছাই পূর্ণ হবে। জঙ্গী-চক্র-নিয়ন্ত্রিত ঢাকা বেতার থেকে কিছুদিন আগে প্রচার করা হয়েছে, ভারতে বেসব শরণার্থী এসেছেন, তাঁদের মধ্যে মুসলমানেরা ভারত সরকারের কাছ থেকে অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার এবং হিন্দুরা সমাদর পাচ্ছেন। ভারতে আগত মুসলিম শরণার্থী মাত্রেই জানেন, এর চাইতে ডাহা মিথ্যা আর কিছু হতে পারে না। এই মিথ্যা প্রচারেরও আসল উদ্দেশ্য, বাংলাদেশ এবং ভারত দু'দেশেই সাম্প্রদায়িক ভুলবোঝ বুঝি ও বিদ্বেষ জাগ্রত করা এবং ইসলামাবাদের জঙ্গী-চক্রের হীন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা। আগরতলায় জনৈক দায়িত্বশীল ভারতীয় মুসলমান আমাকে বলেছেন, 'ইয়াহিয়া চান ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধুক। ভারতে আমরা কয়েক কোটী মুসলমান রয়েছি। আমাদের শান্তি ও নিরাপত্তার কথা তিনি বিস্মৃত হয়েছেন। অথচ মুখে তিনি দাবী করছেন, ইসলাম ও মুসলমানের নিরাপত্তার জন্যই তাঁর সরকারের এসব কান্ডকীর্তি।'

আসল রাজনৈতিক মতলব

জিন্নার পরে লিয়াকত আলী এবং লিয়াকত আলীর তিরোধানের দীর্ঘ দিন পর ভুট্টো পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃত্ব করায়ত্ত করেন। যদিও 'ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থ-রক্ষা' এই শ্লোগানের আড়ালেই এই তিন নেতার রাজনীতি, তথাপি এঁদের একজনও পাকিস্তানে সংখ্যাগুরু বাঙালী মুসলমানদের কখনো বিশ্বাস করেননি। স্বাধীনতা-পূর্ব যুগ থেকে স্বাধীনতা পরবর্তী যুগ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে জিন্না-হক বিরোধ, লিয়াকত-সোহ্‌রাওয়ার্দী বিরোধ এবং সর্বশেষ পর্যায়ে ভুট্টো-মুজিব বিরোধ ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় বিচার্য। জিন্না ফজলুল হককে 'কংগ্রেস ও শ্যামাপ্রসাদের ক্রীড়নক' আখ্যা দিয়ে ছিলেন। ১৯৫১ সালে স্বাধীনতা দিবসে করাচীর জাহাঙ্গীর পার্কের সভায় দাঁড়িয়ে লিয়াকত আলি বলেছেন, 'সোহ্‌রাওয়ার্দী ভারতের লেলিয়ে দেয়া কুত্তা'। এর পর বাংলাদেশের অবিসম্বাদিত জাতীয় নেতা হিসাবে শেখ মুজিব পর্যায়ক্রমে আইয়ুব, ইয়াহিয়া ও ভুট্টো কর্তৃক 'ভারতের এজেন্ট' ও 'দেশদ্রোহী' হিসেবে চিহ্নিত হবেন এতে নতুনত্ব কিছু নেই। এসব ঘটনাই প্রমাণ করে, বাংলাদেশ ও পশ্চিম পাকিস্তানের জাতীয় স্বার্থ ও জাতীয় লক্ষ্য অভিন্ন নয়। ফলে এই দু' অঞ্চলের জাতীয় নেতৃত্বের মধ্যেও কখনো প্রকৃত সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ধর্মীয় জাতীয়তার অবাস্তব ভিত্তির উপর এই সমঝোতা সম্ভবও নয়। জিন্না তা জানতেন। তাই বাংলাদেশের মুসলমানদের রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্যবোধ ঘুচাবার জন্য বাংলাভাষাকে হত্যায় তিনি উদ্যত হয়েছিলেন। যারা তাঁর এই ভাষা-নিধন কার্যে বাধা দিতে চেয়েছে, 'ভারত ও হিন্দুর এজেন্ট' আখ্যা দিয়ে তাদের তিনি জেলে পুরেছেন। লিয়াকত আলির অগণতান্ত্রিক শাসনতান্ত্রিক ফরমুলার বিরুদ্ধে যখন সারা বাংলাদেশ সোচ্চার তখন ভারতের বিরুদ্ধে বদ্ধমুষ্টি উঁচিয়ে ভারত-বিদ্বেষের বন্যা ছুটিয়ে তিনি বাংলাদেশের শাসনতান্ত্রিক আন্দোলন দমাতে চেয়েছেন। জিন্না ও লিয়াকত আলির আমলে ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে হিন্দু পন্ডিত ও শিক্ষাবিদদের বিতাড়ণ করা হয়, উচ্চ সরকারী পদে হিন্দু নিয়োগ বন্ধ করা হয়, হিন্দুদের ব্যবসা-বাণিজ্য গুটাতে বাধ্য করা হয়। ১৯৬৫ সালে সেপ্টেম্বর মাসের যুদ্ধের পর অসংখ্য হিন্দু নাগরিকের ঘরবাড়ী ও সম্পত্তির উপর শত্রু-সম্পত্তি ছাপ মেরে তা জবর দখল করা হয়। চিন্তায় ও কর্মে ডানপন্থী এমন বহু হিন্দু রাজনৈতিক নেতা দেশত্যাগে সম্মত না হওয়ায় বছরের পর বছর জেলে কাটিয়েছেন এবং বরিশালের শ্রীসতীন সেনের মত কয়েক-জন হিন্দু নেতা লোকচক্ষুর আড়ালে জেলেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বাংলাদেশে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর যখনই কোন রাজনৈতিক আন্দোলন হয়েছে, তার প্রথম বলি হয়েছেন হিন্দু নেতা ও বুদ্ধিজীবিরা। অনেকে বৃদ্ধ বয়সে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত না থাকা সত্ত্বেও পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত কেন্দ্রীয় সরকারের রোষ ও নির্যাতন থেকে বাঁচতে পারেননি। বাংলাদেশে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে গোয়েন্দা-বিভাগ হিন্দু নেতা ও বুদ্ধিজীবিদের একটা তালিকা প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। ঢাকায় কোন আন্দোলন শুরু হলে—তা ভাষা আন্দোলন হোক, শাসনতান্ত্রিক আন্দোলন হোক আর শিক্ষা আন্দোলন হোক, প্রথমেই হিন্দু নেতা ও বুদ্ধিজীবিদের আটক করা হোত। তার পরআন্দোলনে যারা অংশ নিয়েছেন, এমন মুসলমান নেতাদের ধরা হতো। সরকারী প্রচার-পত্রে এবং সরকার সমর্থক সংবাদপত্রে প্রচার চালানো হতো, ধৃত মুসলমান নেতারা ভারতের যোগসাজসে পাকিস্তানকে ধ্বংস করার পরিকল্পনা এটে-ছিলেন। এই উগ্র ভারত-বিরোধী,

জয়নুল আবেদিন ॥ গান টানা ॥ জল-রং ১৯৫৮

সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু-বিরোধী অসুস্থ রাজনীতির গোড়াপত্তন করে যান জিন্না নিজে। তিনি বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনকে ভারত ও হিন্দুর চক্রান্ত আখ্যা দেন। তিনি আশা করতেন, যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ তার ধর্মীয় জাতীয়তার ভিত্তি, পাকিস্তানে তাকে জিইয়ে রাখতে পারলে বাঙ্গালি, সিন্ধী পাঠান, বালুচী প্রভৃতি স্বতন্ত্র জাতি-সত্তাগুলোর স্বাতন্ত্র্য মেনে নিতে হবে না এবং বাংলাদেশকে রাষ্ট্রক্ষমতায় সংখ্যাগুরুর অধিকার নিয়ে অংশ গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখা যাবে। জিন্না যেমন পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু বাঙ্গালীদের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা অর্পণ করতে চাননি, তেমনি চাননি লিয়াকত আলি, মমতাজ দৌলতানা, চৌধুরী মোহাম্মদ আলি। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পর ভুট্টোও এই একই নীতি অনুসরণ করতে চেয়েছিল। পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র প্রণয়নে মূল সমস্যা এখানেই। জিন্না থেকে শুরু করে ভুট্টো ও ইয়াহিয়া খাঁ সবাই চেয়েছেন, পাকিস্তানে এমন একটি শাসনতন্ত্র তৈরী হোক, যে শাসনতন্ত্রে বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠতা উপেক্ষিত হবে এবং রাষ্ট্রক্ষমতা কার্যতঃ তাঁদের হাতে থাকবে। এই ইচ্ছা থেকেই ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রে সংখ্যাসাম্যের অগণতান্ত্রিক বিধান যুক্ত করা হয় এবং হিন্দু ও মুসলমান নাগরিকদের জন্য পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা করে কার্যতঃ বাংলাদেশের হিন্দু ও মুসলমান পরিষদ সদস্যদের পৃথক করা এবং বাঙ্গালী পরিষদ সদস্যদের জাতীয় পরিষদে সংখ্যালঘুতে পরিণত করার ষড়যন্ত্র করা হয়। কিন্তু বাংলাদেশে যুক্ত নির্বাচনের পক্ষে প্রবল আন্দোলন হওয়ায় পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন চক্রের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়। হিন্দু নেতাদের উপর এই চক্রের আরো ক্রুদ্ধ হওয়ার কারণ, বাংলাদেশে হিন্দু সংখ্যালঘুরা সর্বপ্রকার রাজনৈতিক অধিকার বঞ্চিত থাকা সত্ত্বেও হিন্দু নেতারা পৃথক নির্বাচনের ফাঁদে পা দিতে রাজি হননি। বরং তাঁরা এক-বাক্যে যুক্ত নির্বাচনের পক্ষে রায় দিয়েছেন। এই সময় পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর সমর্থক সংবাদপত্র এই মর্মেও প্রচার চালানো হয়েছিল যে, 'যুক্ত নির্বাচন হচ্ছে যুক্ত বঙ্গ গঠনের পুরনো ভারতীয় চক্রান্তের অংশ।' ১৯৬২ সালের আইয়ুবী শাসনতন্ত্রে জনগণের ভোটাধিকার হরণেরও মূল উদ্দেশ্য ছিল; বাংলাদেশকে রাষ্ট্র পরিচালনা-ক্ষমতায় ন্যায্য অংশ গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখা। বাংলাদেশ রাষ্ট্রক্ষমতার প্রাপ্য অংশ পেলে উপনিবেশ ও একচেটিয়া বাজার হিসাবে একে আর ব্যবহার করা যাবে না এবং পাকিস্তানের অস্বাভাবিক সামরিক বাজেটের সিংহ ভাগ পশ্চিম পাঞ্জাবের মিলিটারী আমলাদের কব্জায় থাকবে না, এই ভয় থেকেই গত তেইশ বছরের রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের জন্ম ও বিকাশ। বাংলাদেশের হিন্দুরা এই ষড়যন্ত্রে দাবার ঘুঁটি হতে চাননি, বরং মুসলমান বাঙ্গালীদের জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে নিজেদের একাত্ম করে তুলেছেন, এটাই তাঁদের বড় অপরাধ। গত তেইশ বছরে বাংলাদেশকে রাজনৈতিক অধিকার-বঞ্চিত রাখার বহু চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু কোনটাই সফল হয়নি। তাই এবার চূড়ান্ত ও শেষ চেষ্টা—বাংলাদেশকে হিন্দু শূন্য করা। বাংলাদেশে যত গণহত্যাই চালানো হোক, তাতে সাড়ে পাঁচ কোটি মুসলমানকে একেবারে খতম করা সম্ভব নয়। কিন্তু সওয়া কোটি হিন্দুর একটা বড় অংশকে খতম করা সম্ভব এবং বাকি অংশকে ভারতে ঠেলে দিয়ে পাকিস্তানে বাঙ্গালীর সংখ্যাগরিষ্ঠতা খতম করা সহজ। আর পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশের জনসংখ্যা সওয়া কোটির মতই বেশী। সুতরাং এই সওয়া কোটি হিন্দুকে দেশ ছাড়া করতে পারলে এবং সেই সঙ্গে আরো অর্ধকোটি বাঙ্গালী মুসলমান 'দুষ্কৃতকারী ও দেশদ্রোহী' হিসাবে পাক বাহিনীর সামরিক তৎপরতায় নিহত ও দেশত্যাগী হলে বাংলাদেশ কার্যতঃ পাকিস্তানের সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশে পরিণত হবে এবং তখন বাংলাদেশ সমস্যা নিয়ে পিন্ডির শাসকদের আর ভাবতে হবে না। সম্ভবতঃ এই চিন্তা ভাবনা থেকেই পাকিস্তানে বছরখানেক পরে লোক গণনার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং লাহোরে একটি উর্দু দৈনিক ইতিমধ্যেই সম্পাদকীয় প্রবন্ধে দাবী করেছেন, 'বাংলাদেশে লোক গণনা করা হলে দেখা যাবে পাকিস্তানে বাঙ্গালীর সংখ্যানুপাতিক অংশ শতকরা ৩৫ ভাগও নয়।'

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণ

জিন্নাযুগে পাকিস্তানে যে হিন্দু বিতাড়ন নীতির সূচনা, ইয়াহিয়া-ভুট্টো যুগে তারই নিধন ও উৎসাদন নীতিতে পরিণতি লাভ। দেশ বিভাগের আগে বাংলাদেশের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক নেতৃত্ব ছিল প্রতিষ্ঠিত হিন্দু মধ্যবিত্তের হাতে। নবজাগ্রত মুসলিম মধ্যবিত্তের সঙ্গে এই নিয়ে তার কিছুটা রেষারেষি ও বিরোধও ছিল। এই বিরোধকেই বিদ্বেষে পরিণত করে জিন্না তার ধর্মীয় দ্বিজাতি-তত্ত্বকে কাজে লাগান। কিন্তু দেশ ভাগের পর হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী সরকারী নীতির দরুণ দ্রুত দেশত্যাগ করার পর বাঙ্গালী মুসলিম মধ্যবিত্ত দেখতে পান, চাকরি-বাকরি, শিক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, সেনাবাহিনী বা বৈদেশিক দপ্তর কোথাও তাদের ঈপ্সিত প্রতিষ্ঠা লাভ ঘটেনি; বরং হিন্দু মধ্যবিত্তের শূন্যস্থান পূর্ণ করেছে অবাঙ্গালী মুসলমানেরা। ফলে তাদের রাজনৈতিক অধিকারও খর্ব হতে চলেছে। অতি দ্রুত তারা

ভিন্ন 'পদ্রব' ধরে তৈরি দোরোখা নকশি-কাঁথা।

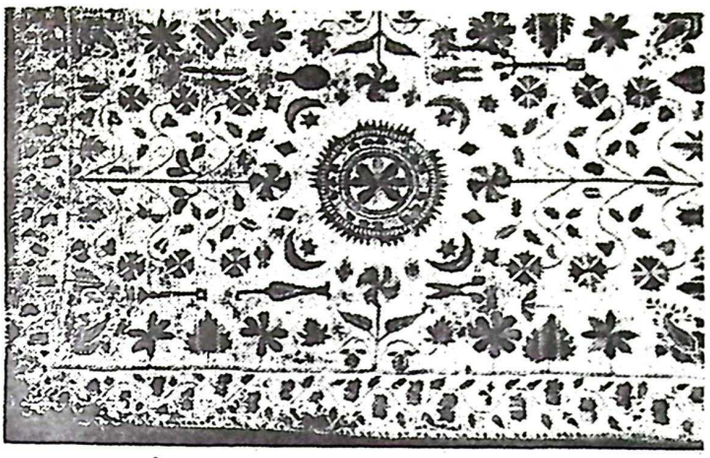

বুঝতে পারেন, তাদের আসল ও মূল শত্রু কারা? ফলে ১৯৫৪ সালের মধ্যে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ভিত্তি নড়বড়ে হয়ে পড়ে এবং মুসলিম লীগ জনগণের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়। ১৯৫০ সালে এবং ১৯৬৪ সালে বাংলাদেশে দুটি বড় রকমের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু এর একটিতেও বাঙ্গালী মুসলমানের উদ্যোগ ও উৎসাহ ছিল না। দুটি দাঙ্গাতেই ছিল সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা। ১৯৫০ সালের দাঙ্গায় মুসলিম লীগের নেতারা দাঙ্গা সৃষ্টিতে প্রকাশ্যে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৬৪ সালে ঢাকার কোন কোন অবাঙ্গালী মিল মালিক তাদের শ্রমিকদের পুরো দিনের সবেতন ছুটি, অস্ত্র ও অন্যান্য সাহায্য দিয়ে দাঙ্গায় অংশ গ্রহণে প্ররোচনা ও উৎসাহ দিয়েছেন। ১৯৫০ সালে বাঙ্গালী মুসলমানেরা দাঙ্গা-প্রতিরোধ করেনি; বরং তাদের একটা অংশ পুরনো সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রভাবে এই দাঙ্গায় অংশ নিয়েছে। কিন্তু ১৯৬৪ সালে বাঙ্গালী মুসলমান সর্বশক্তি দিয়ে দাঙ্গা প্রতিরোধ করেছে এবং দাঙ্গা বাধানোর সরকারী নীতি ব্যর্থ করে দিয়েছে। এই অপরাধে শেখ মুজিবর রহমান সহ কয়েকজন বিশিষ্ট নেতা, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের ও পীড়ন নীতি গ্রহণে তৎকালীন আইয়ুব সরকার দ্বিধা করেন নি।

১৯৫০ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পশ্চাতে উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক স্বার্থে হিন্দু বিতাড়ন। পাকিস্তানের শাসক-চক্র আশা করেছিলেন, হিন্দু মধ্যবিত্তের দেশত্যাগের ফলে বাংলাদেশ রাজনৈতিক প্রতিরোধ-ক্ষমতা হারাবে এবং তার অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা দ্রুত অবাঙ্গালী মুসলমানদের হাতে আসবে। এজন্যে পাকিস্তানের বাজেট তৈরী, শিল্প ও বাণিজ্য নীতিতে এমন পন্থা অনুসরণ করা শুরু হয়, যাতে বাঙ্গালী মুসলমানের হাতে পুঁজি গঠন ও পুঁজি সঞ্চিত হতে না পারে। এতৎ সত্ত্বেও ষাট দশকের গোড়ার দিকে দেখা গেল, বাংলাদেশের সামাজিক কাঠামোর অর্থনৈতিক ভিত্তি হিসাবে হিন্দু সমাজের একটা বড় অংশ রয়ে গেছে—যে অংশের বিনাশ অথবা সম্পূর্ণ উৎসাদন ছাড়া বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রতিরোধের অর্থনৈতিক ভিত্তি ধ্বংস করা সম্ভব নয়। হিন্দু সমাজের এই বড় অংশ হল, জেলে, কুমোর, তাঁতী, কলুই, ভুঁইমালি, ধোবা, নাপিত প্রভৃতি পেশায় নিযুক্ত নিম্নশ্রেণীর হিন্দু। বাঙ্গালী মুসলমানেরা প্রধানতঃ কৃষিজীবী। এসব পেশায় তাদের উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল না। বরং তারা হিন্দু জেলে, তাঁতী, কুমোর, ধোবা, নাপিতের উপর সামাজিকভাবে নির্ভরশীল। এই সামাজিক নির্ভরতা থেকে বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক এতদিনকার বৈরিতার বদলে মিত্রতায় ও সখ্যতায় নতুনভাবে রূপান্তরিত হতে শুরু করে। ইসলামাবাদের শাসক-চক্র তাতে ভয় পেলেন। তারই ফল ১৯৬৫ সালের দাঙ্গা। এই দাঙ্গার পর পরই দেখা গেল, ঢাকার বাজারে আগের মত মাছ উঠছে না। সরকারী প্রচারপত্রে বলা হল, ভারতে মাছ পাচারকারী চোরা-চালানীদের শায়েস্তা করা হয়েছে। দাঙ্গার পর আরো দেখা গেল, ঢাকা ও অন্যান্য শহরগুলো প্রায় হিন্দু ধোবা নাপিত শূন্য হয়ে গেছে। যেখানে সেখানে অবাঙ্গালী মুসলমান পরিচালিত চুল-কাটার সেলুন ও কাপড় ধোয়ার লণ্ড্রির সংখ্যা অতি দ্রুত বেড়ে গেছে। বাংলাদেশের বাজারে সর্ষের তেল মাগ্গি, সময় সময় দুষ্প্রাপ্য। ঘিয়ের ব্যবসা ফেঁপে ফুলে উঠছে। ঢাকার বিখ্যাত কাপড়-কাচা সাবান, আয়ুর্বেদীয় কেশতৈল, নারিকেল তেল বাজারে দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য। তার বদলে করাচী [illegible] লাহোরে তৈরী নিম্নমানের [illegible] ও প্রসাধনী [illegible] বাংলাদেশের বাজার ছেয়ে গেছে।

দ্বিজাতি তত্ত্বের সংহার মূর্তি

বাংলাদেশে ধর্মীয় দ্বিজাতি তত্ত্ব ব্যর্থ হয়েছে। তারই শেষ সংহার মূর্তি আজ সেখানে প্রকট। হিন্দু-নিধন ও বিতাড়ন দ্বারা এই ব্যর্থ ও প্রত্যাখ্যাত তত্ত্বেরই ছিন্ন-মূল আবার বাংলাদেশের মাটিতে রোপণের অপচেষ্টা হচ্ছে। বাংলাদেশ হিন্দু শূন্য হলে এবং বাঙ্গালী মুসলমান মধ্যবিত্তের বর্তমান রাজনৈতিক প্রতিরোধ চূর্ণ করা গেলে বাংলাদেশে শুধু বাঙ্গালিত্ব বর্জিত মুসলমান বাস করবে এবং যারা হবে ইসলামাবাদের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য-শীল, এমন একটা দুরাশা ইয়াহিয়া সরকার এখনও মনে পোষণ করছেন। বাঙ্গালী মুসলমানের অগ্রসর অংশকে নিপাত করে যদি অবশিষ্ট অংশের বাঙ্গালিত্ব হরণ করা যায়, তাহলে বাংলাদেশে ইসলামাবাদের শোড়শ শতকী উপনিবেশ দীর্ঘ-স্থায়ী হবে, এটা তাদের বিশ্বাস। কয়েক লাখ জাতীয়তাবাদী মুসলমান বাঙ্গালীকে হত্যা, হিন্দু-নিধন ও উৎসাদনের পর বাংলাদেশে উর্দু ভাষা ও পশ্চিম পাকিস্তানী সংস্কৃতি চাপিয়ে দেয়া যাবে বলে তারা বিশ্বাস করেন। এরই মধ্যে কিছু সংখ্যক অনুগৃহীত বাঙ্গালীর সহায়তায় শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তথাকথিত ইসলামীকরণের নীতি চালু করা হয়েছে। বেতারে রবীন্দ্র-সঙ্গীত নিষিদ্ধ হয়েছে, বাংলা ছবি প্রদর্শন বন্ধ হয়েছে, দোকানের সাইনবোর্ড ও গাড়ীর নম্বর বাংলায় লেখা বর্জিত হয়েছে এবং শহরাঞ্চলে স্কুল, কলেজ, রাস্তা-ঘাটের নাম পরিবর্তন শুরু হয়েছে। চট্টগ্রামের কাছে বিখ্যাত রেলষ্টেশন ধুমের নামকরণ ইতিপূর্বেই করা হয়েছিল চীন কি আস্তানা, এখন নারায়ণগঞ্জ বন্দরের নাম খিরিজা-বাদ রাখার তোড়জোর হচ্ছে বলে শোনা যাচ্ছে। এইভাবে বাঙ্গালিত্ব বর্জিত বাংলাদেশে ইসলাম ও মুসলমান ধর্ম রক্ষার অজুহাতের আড়ালে ইসলামাবাদের শাসক-চক্র একটি নিকৃষ্ট ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা কায়েম করতে চান। আর এই উপ-নিবেশ রক্ষার জন্যই তারা গত ২৫শে মার্চের পর ইসলাম রক্ষার নামে কয়েক লাখ বাঙ্গালী মুসলমানকে হত্যা করেছেন এবং এক্ষণে বাংলা-দেশকে সম্পূর্ণ হিন্দু শূন্য করার পরিকল্পনা এঁটে বাংলাদেশ এবং ভারত এই দু-দেশেই সাম্প্রদায়িক-তার আগুনকে আবার জীবন্ত করে তুলতে চান। কোটি কোটি মানুষের জীবনের শান্তি ও নিরাপত্তার কোন মূল্য তাদের কাছে নেই। তাদের একমাত্র লক্ষ্য, বাংলাদেশে ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ স্থায়ী করা।

এপার ওপার জুড়ে দু'পার বাংলায়

দিনেশ দাস

ছঠাৎ ঝড়েতে যেন আজ
বিদীর্ণ হয়েছে এক বিশাল জাহাজ,
সে-জাহাজ যেতে যেতে
ভেঙে পড়ে বাংলাদেশের হৃদয়েতে।

অবিরত
চোখের জলের মত
ভেসে আসে কত শব মৃত্যু নিয়ে হাড়ের ভিতরে—
এপার বাংলার ভিজে ডাঙার উপরে।

ভেসে আসে স্রোতে একটানা
আম জাম কাঁঠাল গাছের শব, মাদুর বিছানা
ধুতি, শাড়ি, লুঙ্গি, পায়জামা, কাঁথা;
মরা এলোচুলভরা মাথা
ভেসে চলে পুব হ'তে পশ্চিম বন্দরে—
যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সৈনিকের সাজ প'রে
সেকালের যম
অথবা সে মৃত্যুই স্বয়ং।
কে কালাপাহাড় যেন ক্ষেতের সমস্ত শীষ
ছেঁচে ফেলে দিল অহর্নিশ
তুষ ক'রে ছড়িয়ে দিয়েছে থরে থরে
পদ্মা, মেঘনা, ভৈরবের জলের উপরে

প্রতিটি সোনার শীষ পর পর
সয়েছে অনেক মৃত্যু এক-একটি ধানের ভিতরঃ
প্রত্যহ উৎকর্ণ হ'য়ে আহত, আতুর,
প্রতীক্ষা করেছে শুধু চরম মৃত্যুর।

উন্মাদ সারেঙ তুমি, বোমার নখরে আজ
ভাঙলে তোমার বাংলাদেশের জাহাজ,
প্রতিদিন
আপন হাতেই ভাঙো আপন আইন,
আগুন ধরিয়ে দিলে বসত বাড়িতে,
নিজের নাড়ীতে।

চোখ মেলে চেয়ে দ্যাখো আষাঢ়ের জলে
অন্ধকারে প্রাণের নতুন পাতা জাগে, কথা বলেঃ
ফুলে' ওঠে শত শত
নতুন ফুলের কলি গানের কলির মত
সে-গানে কখনো গান, কখনো শ্লোগান
কখনো বা মেসিনগানের গর্জন—
জেগে ওঠে প্রাচীন নিবিড় বন,
বনের বাঁকানো লতা সাপ হয়ে উঁচু ফণা তোলে।
উপরেতে লোহার আকাশ ফোলে,
উদ্যত বজ্রের মত বিচারের তলোয়ার শুধু ঝলসায়—
এপার ওপার জুড়ে দু'পার বাংলায়॥

This is the introductory copy of *BANGLAR KATHA (Bengal Speaks)* to be published periodically by the *BANGLADESH NEWS & FEATURE SERVICE*. This service will be available both in English and Bengali and is a non-profit-making venture. ... As such generous contributions from our readers will always be welcome. ... All contributions to be in cheques or postal orders and payable to BENGAL EMANCIPATION FUND and should be crossed A/C Payee only.

*** *** *** ***

Other Publications

BANGLADESH : Economic background & Prospects. By Rehman Sobhan. Second print in the press and price 10p plus 3p postage. A must reading for all Bangladesh activists.

'AZAD'KASHMIR: A Colony of the Islamic Republic of Pakistan. By Dr Bashir Asef. With factual details and analysis the author exposes the rape of Kashmir by the West Pakistan colonialists. Price 10p plus postage 3p.

BANGLADESH NEWSLETTER: First issue published on March 30 and since then nine issues have been published. Main features - UK Diary, American Letter, West Pakistan Scene and articles of topical interest.

Distribution Agents:
ISLAM BROTHERS
155A Whitfield Street
London W 1

আর্কাইভজ
-৩৫৭-